

ছোট গল্প

মাল্যদান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



সকালবেলায় শীত-শীত ছিল । দুপুরবেলায় বাতাসটি অল্প একটু তাতিয়া উঠিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে ।

যতীন যে বারান্দায় বসিয়া ছিল, সেখান হইতে বাগানের এক কোণে এক দিকে একটি কাঁঠাল ও আর-একদিকে একটি শিরীষগাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়া বাহিরের মাঠ চোখে পড়ে । সেই শূন্য মাঠ ফাল্গুনের রৌদ্রে ধূধূ করিতেছিল । তাহারই এক প্রান্ত দিয়া কাঁচা পথ চলিয়া গেছে – সেই পথ বাহিয়া বোঝাই-খালাস গোরুর গাড়ি মন্দগমনে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে , গাড়োয়ান মাথায় গামছা ফেলিয়া অত্যন্ত বেকারভাবে গান গহিতেছে ।

এমন সময় পশ্চাতে একটি সহাস্য নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল , “ কী যতীন , পূর্বজন্মের কারও কথা ভাবিতেছ বুঝি? ”

যতীন কহিল , “ কেন পটল, আমি এমনিই কি হতভাগা যে , ভাবিতে হইলেই পূর্বজন্ম লইয়া টান পাড়িতে হয় । ”

আত্মীয়সমাজে ‘পটল ‘ নামে খ্যাত এই মেয়েটি বলিয়া উঠিল , “ আর মিথ্যা বড়াই করিতে হইবে না । তোমার ইহজন্মের সব খবরই তো রাখি , মশায় । ছি ছি , এত বয়স হইল তবু একটা সামান্য বউও ঘরে আনিতে পারিলে না। আমাদের ঐ-যে ধনা মালীটা , ওরও একটা বউ আছে – তার সঙ্গে দুইবেলা ঝগড়া করিয়া সে পাড়াসুদ্ধ লোককে জানাইয়া দেয় যে , বউ আছে বটে। আর তুমি যে মাঠের দিকে তাকাইয়া ভান করিতেছ , যেন কার চাঁদমুখ ধ্যান করিতে বসিয়াছ , এ-সমস্ত চালাকি আমি কি বুঝি না – ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং মাত্র। দেখো যতীন , চেনা

বামুনের পৈতের দরকার হয় না- আমাদের ঐ ধনাটা তো কোনোদিন বিরহের ছুতা করিয়া মাঠের দিকে অমন তাকাইয়া থাকে না; অতিবড়ো বিচ্ছেদের দিনেও গাছের তলায় নিড়ানি হাতে উহাকে দিন কাটাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু উহার চোখে তো অমন ঘোর-ঘোর ভাব দেখি নাই। আর তুমি, মশায়, সাতজন্য বউয়ের মুখ দেখিলে না – কেবল হাসপাতালে মড়া কাটিয়া ও পড়া মুখস্থ করিয়া বয়স পার করিয়া দিলে , তুমি অমনতরো দুপুরবেলা আকাশের দিকে গদগদ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন। না, এ-সমস্ত বাজে চালাকি আমার ভালো লাগে না । আমার গা জ্বালা করে। ”

যতীন হাতজোড় করিয়া কহিল, “থাক্, থাক্ , আর নয়। আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না । তোমাদের ধনাই ধন্য । উহারই আদর্শে আমি চলিতে চেষ্টা করিব। আর কথা নয়, কাল সকালে উঠিয়াই যে কাঠকুড়ানি মেয়ের মুখ দেখিব, তাহারই গলায় মালা দিব – ধিক্কার আমার আর সহ্য হইতেছে না। ”

পটল । তবে এই কথা রইল ?

যতীন । হাঁ , রহিল ।

পটল । তবে এসো ।

যতীন । কোথায় যাইব ।

পটল । এসোই-না ।

যতীন । না, না , একটা-কী দুষ্টুমি তোমার মাথায় আসিয়াছে । আমি এখন নড়িতেছি না ।

পটল । আচ্ছা , তবে এইখানেই বোসো । - বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল ।

পরিচয় দেওয়া যাক । যতীন এবং পটলের বয়সের একদিন মাত্র তারতম্য । পটল যতীনের চেয়ে একদিনের বড়ো বলিয়া যতীন তাহার প্রতি কোনোপ্রকার সামাজিক সম্মান দেখাইতে নারাজ । উভয়ে খুড়তুতো-জাঠতুতো ভাইবোন । বরাবর একত্রে খেলা করিয়া আসিয়াছে । ‘ দিদি ‘ বলে না বলিয়া পটল যতীনের নামে বাল্যকালে বাপ-খুড়ার কাছে অনেক নালিশ করিয়াছে , কিন্তু কোনো শাসনবিধির দ্বারা কোনো ফল পায় নাই - একটিমাত্র ছোটো ভাইয়ের কাছেও তাহার পটল-নাম ঘুচিল না ।

পটল দিব্য মোটাসোটা গোলগাল , প্রফুল্লতার রসে পরিপূর্ণ । তাহার কৌতুকহাস্য দমন করিয়া রাখে , সমাজে এমন কোনো শক্তি ছিল না । শাশুড়ির কাছেও সে কোনোদিন গান্ধীর্ষ্য অবলম্বন করিতে পারে নাই । প্রথম প্রথম তা লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছিল । কিন্তু , শেষকালে সকলকেই হার মানিয়া বলিতে হইল - ওর ঐ রকম । তার পরে এমন যে , পটলের দুর্নিবার প্রফুল্লতার আঘাতে গুরুজনদের গান্ধীর্ষ্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল । পটল তাহার আশেপাশে কোনোখানে মন-ভার মুখ- ভার দুশ্চিন্তা সহিতে পারিত না - অজস্র গল্প-হাসি-ঠাট্টায় তাহার চারি দিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎশক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত ।

পটলের স্বামী হরকুমারবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট – বেহার-অঞ্চল হইতে বদলি হইয়া কলিকাতায় আবগারি-বিভাগে স্থান পাইয়াছেন। প্লেগের ভয়ে বালিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন । আবগারি-পরিদর্শনে প্রায়ই তাঁহাকে মফস্বলে ফিরিতে হইবে বলিয়া দেশ হইতে মা এবং অন্য দুই-একজন আত্মীয়কে আনিবার উপক্রম করিতেছেন , এমন সময় ডাক্তারিতে নূতন-উত্তীর্ণ পসারপ্রতিপত্তিহীন যতীন বোনের নিমন্ত্রণে হুগুখানেকের জন্য এখানে আসিয়াছে।

কলিকাতার গলি হইতে প্রথম দিন গাছপালার মধ্যে আসিয়া যতীন ছায়াময় নির্জন বারান্দায় ফাল্গুন মধ্যাহ্নের রসালসে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল , এমন সময়ে পূর্বকথিত সেই উপদ্রব আরম্ভ হইল। পটল চলিয়া গেলে আবার খানিকক্ষণের জন্য সে নিশ্চিত হইয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বেশ আরাম করিয়া বসিল – কাঠকুড়ানি মেয়ের প্রসঙ্গে ছেলেবেলাকার রূপকথার অলিগলির মধ্যে তাহার মন ঘুরিয়ে বেড়াইতে লাগিল।

এমন সময় আবার পটলের হাসিমাখা কণ্ঠের কাকলিতে সে চমকিয়া উঠিল ।

পটল আর-একটি মেয়ের হাত ধরিয়া সবেগে টানিয়া আনিয়া যতীনের সম্মুখে স্থাপন করিল ; কহিল, “ ও কুড়ানি । ”

মেয়েটি কহিল, “ কী , দিদি । ”

পটল । আমার এই ভাইটি কেমন দেখ্ দেখি ।

মেয়েটি অসংকোচে যতীনকে দেখিতে লাগিল । পটল কহিল , “ কেমন , ভালো দেখিতে না ? ”

মেয়েটি গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল , “ হাঁ, ভালো । ”

যতীন লাল হইয়া চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল , “ আঃ পটল , কী ছেলেমানুষি করিতেছ । ”

পটল। আমি ছেলেমানুষি করি , না তুমি বুড়োমানুষি কর! তোমার বুঝি বয়সের গাছপাথর নাই!

যতীন পলায়ন করিল । পটল তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কহিল , “ ও যতীন , তোমার ভয় নাই , তোমার ভয় নাই । এখনই তোমার মালা দিতে হইবে না – ফাল্গুন-চৈত্রে লগ্ন নাই – এখনো হাতে সময় আছে । ”

পটল যাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে , সেই মেয়েটি অবাক হইয়া রহিল । তাহার বয়স ষোলো হইবে , শরীর ছিপছিপে – মুখশ্রী সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই , কেবল মুখে এই একটি অসামান্যতা আছে যে দেখিলে যেন বনের হরিণের ভাব মনে আসে । কঠিন ভাষায় তাহাকে নির্বুদ্ধি বলা যাইতেও পারে- কিন্তু তাহা বোকামি নহে, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির অপরিষ্ফুরণমাত্র , তাহাতে কুড়ানির মুখের সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়া বরঞ্চ একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে ।

সন্ধ্যাবেলায় হরকুমারবাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে দেখিয়া কহিলেন , “ এই-যে , যতীন আসিয়াছ , ভালোই হইয়াছে । তোমাকে একটু ডাক্তারি করিতে হইবে । পশ্চিমে থাকিতে দুর্ভিক্ষের সময় আমরা একটি মেয়েকে লইয়া মানুষ করিতেছি – পটল তাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে । উহার বাপ-মা এবং ঐ মেয়েটি আমাদের বাংলার কাছে একটি গাছতলায় পড়িয়া ছিল । যখন খবর পাইয়া গোলাম গিয়া দেখি , উহার বাপ-মা মরিয়াছে , মেয়েটির প্রাণটুকু আছে মাত্র । পটল তাহাকে অনেক যত্নে বাঁচাইয়াছে । উহার জাতের কথা কেহ জানে না – তাহা লইয়া কেহ আপত্তি করিলেই পটল বলে , ‘ ও তো দ্বিজ ; একবার মরিয়া এবার আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে , উহার সাবেক জাত কোথায় ঘুচিয়া গেছে । ‘ প্রথমে মেয়েটি পটলকে মা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছিল ; পটল ধমক দিয়া বলিল , ‘ খবরদার, আমাকে মা বলিস নে – আমাকে দিদি বলিস । ‘ পটল বলে , ‘ অতবড়ো মেয়ে মা বলিলে নিজেকে বুড়ি বলিয়া মনে হইবে যে । ‘ বোধ করি সেই দুর্ভিক্ষের উপবাসে বা আর-কোনো কারণে উহার থাকিয়া থাকিয়া শূলবেদনার মতো হয় । ব্যাপারখানা কী, তোমাকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে । ওরে তুল্ সি , কুড়ানিকে ডাকিয়া আন্ তো । ”

কুড়ানি চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অসম্পূর্ণ বেণী পিঠের উপরে দুলাইয়া হরকুমারবাবুর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহার হরিণের মতো চোখদুটি দুজনের উপর রাখিয়া সে চাহিয়া রহিল ।

যতীন ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া হরকুমার তাহাকে কহিলেন , “ বৃথা সংকোচ করিতেছ , যতীন । উহাকে দেখিতে মস্ত ডাগর , কিন্তু কচি ডাবের মতো উহার ভিতরে কেবল জল ছল্ছল্ করিতেছে – এখনো

শাঁসের রেখা মাত্র দেখা দেয় নাই। ও কিছুই বোঝে না – উহাকে তুমি নারী বলিয়া ভ্রম করিয়ো না , ও বনের হরিণী । ”

যতীন তাহার ডাক্তারী কর্তব্য সাধন করিতে লাগিল – কুড়ানি কিছুমাত্র কুষ্ঠা প্রকাশ করিল না। যতীন কহিল, “শরীরযন্ত্রের কোনো বিকার তো বোঝা গেল না। ”

পটল ফস্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল , “ হৃদয়যন্ত্রেরও কোনো বিকার ঘটে নাই । তার পরীক্ষা দেখিতে চাও ? ”

বলিয়া কুড়ানির কাছে গিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল, “ও কুড়ানি, আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে?”

কুড়ানি মাথা হেলাইয়া কহিল, “ হাঁ । ”

পটল কহিল , “ আমার ভাইকে তুই বিয়ে করিবি ? ”

সে আবার মাথা হেলাইয়া কহিল , “ হাঁ । ”

পটল এবং হরকুমারবাবু হাসিয়া উঠিলেন । কুড়ানি কৌতুকের মর্ম না বুঝিয়া তাঁহাদের অনুকরণে মুখখানি হাসিতে ভরিয়া চাহিয়া রহিল ।

যতীন লাল হইয়া উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল , “ আঃ, পটল , তুমি বাড়াবাড়ি করিতেছ – ভারি অন্যায় । হরকুমারবাবু , আপনি পটলকে বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিয়া থাকেন । ”

হরকুমার কহিলেন , “ নহিলে আমিও যে উঁহার কাছে প্রশ্নয় প্রত্যাশা করিতে পারি না । কিন্তু যতীন , কুড়ানিকে তুমি জান না বলিয়াই অত ব্যস্ত হইতেছ । তুমি লজ্জা করিয়া কুড়ানিকে সুদ্ধ লজ্জা করিতে শিখাইবে দেখিতেছি । উহাকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল তুমি খাওয়াইয়ো না । সকলে উহাকে লইয়া কৌতুক করিয়াছে – তুমি যদি মাঝের থেকে গান্ধীৰ্য দেখাও তবে সেটা উহার পক্ষে একটা অসংগত ব্যাপার হইবে । ”

পটল । ঐজন্যই তো যতীনের সঙ্গে আমার কোনোকালেই বনিল না , ছেলেবেলা থেকে কেবলই ঝগড়া চলিতেছে – ও বড়ো গান্ধীৰ্য ।

হরকুমার । ঝগড়া করাটা বুঝি এমনি করিয়া একেবারে অভ্যাস হইয়া গেছে – ভাই সরিয়া পড়িয়াছেন , এখন –

পটল । ফের মিথ্যা কথা । তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সুখ নাই – আমি চেষ্টাও করি না ।

হরকুমার । আমি গোড়াতেই হার মানিয়া যাই ।

পটল । বড়ো কর্মই করো । গোড়ায় হার না মানিয়া শেষে হার মানিলে কত খুশি হইতাম ।

রাত্রে শোবার ঘরে জানলা-দরজা খুলিয়া দিয়া যতীন অনেক কথা ভাবিল । যে মেয়ে আপনার বাপ-মাকে না খাইতে পাইয়া মরিতে দেখিয়াছে, তাহার জীবনের উপর কী ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে । এই নিদারুণ ব্যাপারে সে কত বড়ো হইয়া উঠিয়াছে – তাহাকে লইয়া কি কৌতুক করা যায় । বিধাতা দয়া করিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উপরে একটা আবরণ ফেলিয়া

দিয়াছেন – এই আবরণ যদি উঠিয়া যায় তবে অদৃষ্টের রুদ্রলীলার কী ভীষণ চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে । আজ মধ্যাহ্নে গাছের ফাঁক দিয়া যতীন যখন ফাল্গুনের আকাশ দেখিতেছিল , দূর হইতে কাঁঠালমুকুলের গন্ধ মৃদুতর হইয়া তাহার ঘ্রাণকে আবিষ্ট করিয়া ধরিতেছিল , তখন তাহার মনটা মাধুর্যের কুহেলিকায় সমস্ত জগৎটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিয়াছিল- ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার হরিণের মতো চোখদুটি লইয়া সেই সোনালি কুহেলিকা অপসারিত করিয়া দিয়াছে ; ফাল্গুনের এই কূজন-গুঞ্জন-মর্মরের পশ্চাতে যে সংসার ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দুঃখ কঠিন দেহ লইয়া বিরাট মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছে , উদ্ঘাটিত যবনিকার শিল্পমাধুর্যের অন্তরালে সে দেখা দিল ।

পরদিন সন্ধ্যার সময় কুড়ানির সেই বেদনা ধরিল । পটল তাড়াতাড়ি যতীনকে ডাকিয়া পাঠাইল । যতীন আসিয়া দেখিল কষ্টে কুড়ানির হাতে পায়ে খিল ধরিতেছে , শরীর আড়ষ্ট । যতীন ঔষধ আনিতে পাঠাইয়া বোতলে করিয়া গরম জল আনিতে লুকুম করিল । পটল কহিল , “ ভারি মস্ত ডাক্তার হইয়াছ , পায়ে একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দাও-না । দেখিতেছ না পায়ের তলা হিম হইয়া গেছে । ”

যতীন রোগিণীর পায়ের তলায় গরম তেল সবেগে ঘষিয়া দিতে লাগিল । চিকিৎসাব্যাপারে রাত্রি অনেক হইল । হরকুমার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বারবার কুড়ানির খবর লইতে লাগিলেন । যতীন বুঝিল , সন্ধ্যাবেলায় কর্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল-অভাবে হরকুমারের অবস্থা অচল হইয়া উঠিয়াছে – ঘন ঘন কুড়ানির খবর লইবার তাৎপর্য তাই । যতীন কহিল , “ হরকুমারবাবু ছটফট করিতেছেন; তুমি যাও, পটল । ”

পটল কহিল , “ পরের দোহাই দিবে বৈ-কি । ছট্‌ফট্‌ কে করিতেছে তা বুঝিয়াছি । আমি গেলেই এখন তুমি বাঁচো । এ দিকে কথায় কথায় লজ্জায় মুখচোখ লাল হইয়া উঠে – তোমার পেটে যে এত ছিল তা কে বুঝিবে । ”

যতীন । আচ্ছা , দোহাই তোমার , তুমি এইখানেই থাকো । রক্ষা করো – তোমার মুখ বন্ধ হইলে বাঁচি । আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম – হরকুমারবাবু বোধ হয় শান্তিতে আছেন , এরকম সুযোগ তাঁর সর্বদা ঘটে না ।

কুড়ানি আরাম পাইয়া যখন চোখ খুলিল পটল কহিল , “ তোর চোখ খোলাইবার জন্য তোর বর যে আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তোকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে – আজ তাই বুঝি এত দেরি করিলি । ছি ছি , গুঁর পায়ের ধুলা নে । ”

কুড়ানি কতর্ব্যবোধে তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে যতীনের পায়ের ধুলা লইল । যতীন দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল ।

তাহার পরদিন হইতে যতীনের উপরে রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ হইল । যতীন খাইতে বসিয়াছে , এমন সময় কুড়ানি অম্লানবদনে পাখা দিয়া তাহার মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হইল । যতীন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল , “ থাক্ থাক্ , কাজ নাই । ” কুড়ানি এই নিষেধে বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্‌বর্তী ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল – তাহার পরে আবার পুনশ্চ পাখা দোলাইতে লাগিল । যতীন অন্তরালবর্তিনীর উদ্দেশে বলিয়া উঠিল , “ পটল , তুমি যদি এমন করিয়া আমাকে জ্বালাও তবে আমি খাইব না – আমি এই উঠিলাম । ”

বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিল । যতীন বালিকার বুদ্ধিহীন মুখে তীব্র বেদনার রেখা দেখিতে পাইল ; তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া সে পুনর্বীর বসিয়া পড়িল । কুড়ানি যে কিছু বোঝে না , সে যে লজ্জা পায় না , বেদনা বোধ করে না , এ কথা যতীনও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । আজ চকিতের মধ্যে দেখিল , সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে , এবং ব্যতিক্রম কখন হঠাৎ ঘটে আগে হইতে তাহা কেহই বলিতে পারে না । কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল ।

পরদিন সকালে যতীন বারান্দায় বসিয়া আছে , গাছপালার মধ্যে কোকিল অত্যন্ত ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে , আমের বোলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত – এমন সময় সে দেখিল , কুড়ানি চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া যেন একটু ইতস্তত করিতেছে । তাহার হরিণের মতো চক্ষে একটা সঙ্কল্প ভয় ছিল – সে চা লইয়া গেলে যতীন বিরক্ত হইবে কি না ইহা যেন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না । যতীন ব্যথিত হইয়া উঠিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার হাত হইতে পেয়ালা লইল । এই মানবজন্মের হরিণশিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায় । যতীন যেমনি পেয়ালা লইল অমনি দেখিল , বারান্দার অপর প্রান্তে পটল সহসা আবির্ভূত হইয়া নিঃশব্দহাস্যে যতীনকে কিল দেখাইল; ভাবটা এই যে , “ কেমন ধরা পড়িয়াছ । ”

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যতীন একখানি ডাক্তারি কাগজ পড়িতেছিল , এমন সময় ফুলের গন্ধে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল , কুড়ানি বকুলের মালা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল । যতীন মনে মনে কহিল , ‘

বড়োই বাড়াবাড়ি হইতেছে – পটলের এই নিষ্ঠুর আমোদে আর প্রশয় দেওয়া উচিত হয় না । ‘

কুড়ানিকে বলিল , “ ছি ছি কুড়ানি , তোমাকে লইয়া তোমার দিদি আমোদ করিতেছেন , তুমি বুঝিতে পার না! ”

কথা শেষ করিতে না করিতেই কুড়ানি দ্রুত সংকুচিত ভাবে প্রস্থানের উপক্রম করিল । যতীন তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া কহিল , “ কুড়ানি , দেখি, তোমার মালা দেখি । ” বলিয়া মালাটি তাহার হাত হইতে লইল । কুড়ানির মুখে একটি আনন্দের উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল , অন্তরাল হইতে সেই মুহূর্তে একটি উচ্চহাস্যের উচ্ছ্বাসধ্বনি শুনা গেল ।

পরদিন সকালে উপদ্রব করিবার জন্য পটল যতীনের ঘরে গিয়া দেখিল , ঘর শূন্য । একখানি কাগজে কেবল লেখা আছে – “ পালাইলাম । শ্রীযতীন । ”

“ ও কুড়ানি , তোর বর যে পালাইল । তাহাকে রাখিতে পারিলি নে! ” বলিয়া কুড়ানির বেণী ধরিয়া নাড়া দিয়া পটল ঘরকন্নার কাজে চলিয়া গেল ।

কথাটা বুঝিতে কুড়ানির একটু সময় গেল । সে ছবির মতো দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল । তাহার পর ধীরে ধীরে যতীনের ঘরে আসিয়া দেখিল , তাহার ঘর খালি । তার পূর্বসন্ধ্যার উপহারের মালাটা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে ।

বসন্তের প্রাতঃকালটি স্নিগ্ধসুন্দর ; রৌদ্রটি কম্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখার ভিতর দিয়া ছায়ার সহিত মিশিয়া বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে । কাঠবেড়ালি লেজ পিঠে তুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে এবং সকল পাখি মিলিয়া নানা সুরে গান গাহিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় কিছুতেই শেষ করিতে পারিতেছে না । পৃথিবীর এই কোণটুকুতে , এই খনিকটা ঘনপল্লব ছায়া এবং রৌদ্ররচিত জগৎখণ্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল ; তাহারই মাঝখানে ঐ বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার জীবনের , তাহার চারি দিকের সংগত কোনো অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না । সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা । কী হইল , কেন এমন হইল , তার পরে এই প্রভাত , এই গৃহ , এই যাহা-কিছু সমস্তই এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন । যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল । জগতের এই সহজ-উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালা-মৃগ-পক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরবের মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে ।

পটল ঘরকন্নার কাজ সারিয়া কুড়ানির সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিল , সে যতীনের পরিত্যক্ত ঘরে তাহার খাটের খুরা ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে – শূন্য শয্যাটাকে যেন পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে । তাহার বুকের ভিতরে যে- একটি সুধার পাত্র লুকানো ছিল সেইটে যেন শূন্যতার চরণে বৃথা আশ্বাসে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে – ভূমিতলে পুঞ্জীভূত সেই স্থলিতকেশা লুপ্তিবসনা নারী যেন নীরব একাগ্রতার ভাষায় বলিতেছে , “ লও , লও , আমাকে লও । ওগো , আমাকে লও । ”

পটল বিস্মিত হইয়া কহিল , “ ও কী হইতেছে , কুড়ানি । ”

কুড়ানি উঠিল না ; সে যেমন পড়িয়া ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল । পটল কাছে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল ।

পটল তখন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল , “ ও পোড়ারমুখি , সর্বনাশ করিয়াছিস। মরিয়াছিস! ”

হরকুমারকে পটল কুড়ানির অবস্থা জানাইয়া কহিল , “ এ কী বিপদ ঘটিল । তুমি কী করিতেছিলে , তুমি আমাকে কেন বারণ করিলে না । ”

হরকুমার কহিল , “ তোমাকে বারণ করা যে আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই । বারণ করিলেই কি ফল পাওয়া যাইত । ”

পটল । তুমি কেমন স্বামী। আমি যদি ভুল করি , তুমি আমাকে জোর করিয়া থামাইতে পার না ? আমাকে তুমি এ খেলা খেলিতে দিলে কেন ।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া ভূপতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল , “ লক্ষ্মী বোন আমার , তোর কী বলিবার আছে আমাকে খুলিয়া বল্ । ”

হায় , কুড়ানির এমন কী ভাষা আছে যে , আপনার হৃদয়ের অব্যক্ত রহস্য সে কথা দিয়া বলিতে পারে । সে একটি অনির্বচনীয় বেদনার উপর তাহার সমস্ত বুক দিয়া চাপিয়া পড়িয়া আছে – সে বেদনাটা কী , জগতে

এমন আর কাহারো হয় কি না , তাহাকে লোকে কী বলিয়া থাকে , কুড়ানি তাহার কিছুই জানে না । সে কেবল কান্না দিয়া বলিতে পারে ; মনের কথা জানাইবার তাহার আর কোনো উপায় নাই ।

পটল কহিল , “ কুড়ানি , তোর দিদি বড়ো দুষ্ট ; কিন্তু তার কথা যে তুই এমন করিয়া বিশ্বাস করিবি , তা সে কখনো মনেও করে নি । তার কথা কেহ কখনো বিশ্বাস করে না ; তুই এমন ভুল কেন করিলি । কুড়ানি , একবার মুখ তুলিয়া তোর দিদির মুখের দিকে চা ; তাকে মাপ কর । ”

কিন্তু , কুড়ানির মন তখন বিমুখ হইয়া গিয়াছিল , সে কোনোমতেই পটলের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না ; সে আরো জোর করিয়া হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া রহিল । সে ভালো করিয়া সমস্ত কথা না বুঝিয়াও একপ্রকার মূঢ়ভাবে পটলের প্রতি রাগ করিয়াছিল । পটল তখন ধীরে ধীরে বাহুপাশ খুলিয়া লইয়া উঠিয়া গেল – এবং জানালার ধারে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ফাল্গুনের রৌদ্রচিক্ৰণ সুপারিগাছের পল্লবশ্রেণীর দিকে চাহিয়া পটলের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল ।

পরদিন কুড়ানির আর দেখা পাওয়া গেল না । পটল তাহাকে আদর করিয়া ভালো ভালো গহনা এবং কাপড় দিয়া সাজাইত । নিজে সে এলোমেলো ছিল , নিজের সাজ সম্বন্ধে তাহার কোনো যত্ন ছিল না , কিন্তু সাজগোজের সমস্ত শখ কুড়ানির উপর দিয়াই সে মিটাইয়া লইত । বহুকালসঞ্চিত সেই-সমস্ত বসনভূষণ কুড়ানির ঘরের মেজের উপর পড়িয়া আছে । তাহার হাতের বালাচুড়ি , নাসাগ্রের লবঙ্গফুলটি পর্যন্ত সে খুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে । তাহার পটলদিদির এতদিনের সমস্ত আদর সে যেন গা হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে ।

হরকুমারবাবু কুড়ানির সম্বন্ধে পুলিশে খবর দিলেন । সেবারে প্লেগ-দমনের বিভীষিকায় এত লোক এত দিকে পলায়ন করিতেছিল যে , সেই-সকল পলাতকদের মধ্য হইতে একটি বিশেষ লোককে বাছিয়া লওয়া পুলিশের পক্ষে শক্ত হইল । হরকুমারবাবু দুই-চারিবার ভুল লোকের সন্ধানে অনেক দুঃখ এবং লজ্জা পাইয়া কুড়ানির আশা পরিত্যাগ করিলেন । অজ্ঞাতের কোল হইতে তাঁহারা যাহাকে পাইয়াছিলেন অজ্ঞাতের কোলের মধ্যেই সে আবার লুকাইয়া পড়িল ।

যতীন বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেবার প্লেগ-হাসপাতালে ডাক্তারি-পদ গ্রহণ করিয়াছিল । একদিন দুপুরবেলায় বাসায় আহার সারিয়া হাসপাতালে আসিয়া সে শুনিল , হাসপাতালের স্ত্রী-বিভাগে একটি নূতন রোগিণী আসিয়াছে । পুলিশ তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে ।

যতীন তাহাকে দেখিতে গেল। মেয়েটির মুখের অধিকাংশ চাদরে ঢাকা ছিল। যতীন প্রথমেই তাহার হাত তুলিয়া লইয়া নাড়ী দেখিল। নাড়ীতে জ্বর অধিক নাই, কিন্তু দুর্বলতা অত্যন্ত। তখন পরীক্ষার জন্য মুখের চাদর সরাইয়া দেখিল, সেই কুড়ানি ।

ইতিমধ্যে পটলের কাছ হইতে যতীন কুড়ানির সমস্ত বিবরণ জানিয়াছিল । অব্যক্ত হৃদয়ভাবের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন তাহার সেই হরিণচক্ষুদুটি কাজের অবকাশে যতীনের ধ্যানদৃষ্টির উপরে কেবলই অশ্রুহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিয়াছে । আজ সেই রোগনিমীলিত চক্ষুর সুদীর্ঘ পল্লব কুড়ানির শীর্ণ কপোলের উপরে কালিমার রেখা টানিয়াছে ; দেখিবামাত্র যতীনের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কে যেন চাপিয়া ধরিল । এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফুলের মতো সুকুমার করিয়া গড়িয়া দুর্ভিক্ষ হইতে মারীর মধ্যে

ভাসাইয়া দিলেন কেন । আজ এই-যে পেলব প্রাণটি ক্লিষ্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আছে , ইহার এই অল্প কয়দিনের আয়ুর মধ্যে এত বিপদের আঘাত , এত বেদনার ভার সহিল কী করিয়া , ধরিল কোথায় । যতীনই-বা ইহার জীবনের মাঝখানে তৃতীয় আর-একটি সংকটের মতো কোথা হইতে আসিয়া জড়াইয়া পড়িল । রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস যতীনের বক্ষোদ্বারে আঘাত করিতে লাগিল – কিন্তু সেই আঘাতের তাড়নায় তাহার হৃদয়ের তারে একটা সুখের মীড়ও বাজিয়া উঠিল । যে ভালোবাসো জগতে দুর্লভ , যতীন তাহা না চাহিতেই , ফাল্গুনের একটি মধ্যাহ্নে একটি পূর্ণবিকশিত মাধবীমঞ্জরির মতো অকস্মাৎ তার পায়ের কাছে আপনি আসিয়া খসিয়া পড়িয়াছে । যে ভালোবাসা এমন করিয়া মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে , পৃথিবীতে কোন্ লোক সেই দেবভোগ্য নৈবেদ্যলাভের অধিকারী ।

যতীন কুড়ানির পাশে বসিয়া তাহাকে অল্প অল্প গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিল । খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল । যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে সুদূর স্বপ্নের মতো যেন মনে করিয়া লইতে চেষ্টা করিল । যতীন যখন তাহার কপালে হাত রাখিয়া একটুখানি নাড়া দিয়া কহিল “ কুড়ানি ” তখন তাহার অজ্ঞানের শেষ ঘোরটুকু হঠাৎ ভাঙিয়া গেল – যতীনকে সে চিনিলা এবং তখনই তাহার চোখের উপরে বাষ্পকোমল আর-একটি মোহের আবরণ পড়িল । প্রথম-মেঘ সমাগমে সুগম্ভীর আষাঢ়ের আকাশের মতো কুড়ানির কালো চোখদুটির উপর একটি যেন সুদূরব্যাপী সজলস্নিগ্ধতা ঘনাইয়া আসিল ।

যতীন সন্ধ্যার যত্নের সহিত কহিল , “ কুড়ানি , এই দুধটুকু শেষ করিয়া ফেলো । ”

কুড়ানি একটু উঠিয়া বসিয়া পেয়ালার উপর হইতে যতীনের মুখে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সেই দুধটুকু ধীরে ধীরে খাইয়া ফেলিল ।

হাসপাতালের ডাক্তার একটিমাত্র রোগীর পাশে সমস্তক্ষণ বসিয়া থাকিলে কাজও চলে না , দেখিতেও ভালো হয় না । অন্যত্র কতব্য সারিবার জন্য যতীন যখন উঠিল তখন ভয়ে ও নৈরাশ্যে কুড়ানির চোখদুটি ব্যাকুল হইয়া পড়িল । যতীন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল , “ আমি আবার এখনই আসিব, কুড়ানি , তোমার কোনো ভয় নাই । ”

যতীন কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইল যে , এই নূতন-আনীত রোগিনীর প্লেগ হয় নাই , সে না খাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে । এখানে অন্য প্লেগরোগীর সঙ্গে থাকিলে তাহার পক্ষে বিপদ ঘটিতে পারে ।

বিশেষ চেষ্টা করিয়া যতীন কুড়ানিকে অন্যত্র লইয়া যাইবার অনুমতি লাভ করিল এবং নিজের বাসায় লইয়া গেল । পটলকে সমস্ত খবর দিয়া একখানি চিঠিও লিখিয়া দিল ।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় রোগী এবং চিকিৎক ছাড়া ঘরে আর কেহ ছিল না । শিয়রের কাছে রঙিন কাগজের আবরণে ঘেরা একটি কেরোসিন ল্যাম্প ছায়াচ্ছন্ন মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল ব্র্যাকেটের উপরে একটা ঘড়ি নিস্তব্ধ ঘরে টিক্‌টিক্‌ শব্দে দোলক দোলাইতেছিল ।

যতীন কুড়ানির কপালে হাত দিয়া কহিল , “ তুমি কেমন বোধ করিতেছ , কুড়ানি । ”

কুড়ানি তাহার কোনো উত্তর না করিয়া যতীনের হাতটি আপনার কপালেই চাপিয়া রাখিয়া দিল ।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, “ ভালো বোধ হইতেছে ? ”

কুড়ানি একটুখানি চোখ বুজিয়া কহিল, “ হাঁ। ”

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল , “ তোমার গলায় এটা কী কুড়ানি । ”

কুড়ানি তাড়াতাড়ি কাপড়টা টানিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিল । যতীন দেখিল সে একগাছি শুকনো বকুলের মালা । তখন তাহার মনে পড়িল , সে মালাটা কী । ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দের মধ্যে যতীন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল । কুড়ানির এই প্রথম লুকাইবার চেষ্টা- নিজের হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার এই তাহার প্রথম প্রয়াস । কুড়ানি মৃগশিশু ছিল , সে কখন হৃদয়ভারাতুর যুবতী নারী হইয়া উঠিল । কোন্‌ রৌদ্রের আলোকে , কোন্‌ রৌদ্রের উত্তাপে তাহার বুদ্ধির উপরকার সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তাহার লজ্জা , তাহার শঙ্কা , তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল ।

রাত্রি দুটা-আড়াইটার সময় যতীন চৌকিতে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে । হঠাৎ দ্বার খোলার শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল , পটল এবং হরকুমারবাবু এক বড়ো ব্যাগ হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

হরকুমার কহিলেন , “ তোমার চিঠি পাইয়া কাল সকালে আসিব বলিয়া বিছানায় শুইলাম । অর্ধেক রাত্রে পটল কহিল , ‘ ওগো , কাল সকালে গেলে কুড়ানিকে দেখিতে পাইব না – আমাকে এখনই যাইতে হইবে । ‘ পটলকে কিছুতেই বুঝাইয়া রাখা গেল না, তখনই একটা গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি । ”

পটল হরকুমারকে কহিল , “ চলো , তুমি যতীনের বিছানায় শোবে চলো । ”

হরকুমার ঈষৎ আপত্তির আড়ম্বর করিয়া যতীনের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন , তাঁহার নিদ্রা যাইতেও দেরি হইল না ।

পটল ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে ঘরের এক কোণে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল , “ আশা আছে ? ”

যতীন কুড়ানির কাছে আসিয়া তাহার নাড়ি দেখিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে , আশা নাই ।

পটল কুড়ানির কাছে আপনাকে প্রকাশ না করিয়া যতীনকে আড়ালে লইয়া কহিল , “ যতীন , সত্য বলো , তুমি কি কুড়ানিকে ভালোবাস না । ”

যতীন পটলকে কোনো উত্তর না দিয়া কুড়ানির বিছানার পাশে আসিয়া বসিল । তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল , “ কুড়ানি , কুড়ানি । ”

কুড়ানি চোখ মেলিয়া মুখে একটি শান্ত মধুর হাসির আভাসমাত্র আনিয়া কহিল , “ কী , দাদাবাবু । ”

যতীন কহিল , “ কুড়ানি, তোমার এই মালাটি আমার গলায় পরাইয়া দাও । ”

কুড়ানি অনিমেষ অবুঝ চোখে যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল ।

যতীন কহিল , “ তোমার মালা আমাকে দিবে না ? ”

যতীনের এই আদরের প্রশ্নটুকু পাইয়া কুড়ানির মনে পূর্বকৃত অনাদরের একটুখানি অভিমান জাগিয়া উঠিল । সে কহিল , “ কী হবে , দাদাবাবু । ”

যতীন দুই হাতে তাহার হাত লইয়া কহিল , “ আমি তোমাকে ভালোবাসি , কুড়ানি । ”

শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য কুড়ানি স্তব্ধ রহিল ; তাহার পরে তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল । যতীন বিছানার পাশে নামিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল , কুড়ানির হাতের কাছে মাথা নত করিয়া রাখিল । কুড়ানি গলা হইতে মালা খুলিয়া যতীনের গলায় পরাইয়া দিল ।

তখন পটল তাহার কাছে আসিয়া ডাকিল , “ কুড়ানি । ”

কুড়ানি তাহার শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল , “ কী, দিদি । ”

পটল তাহার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল , “ আমার উপর তোর কোন রাগ নাই , বোন ? ”

কুড়ানি স্নিগ্ধ কোমলদৃষ্টিতে কহিল , “ না , দিদি । ”

পটল কহিল , “ যতীন , একবার তুমি ও ঘরে যাও । ”

যতীন পাশের ঘরে গেলে পটল ব্যাগ খুলিয়া কুড়ানির সমস্ত কাপড়-গহনা তাহার মধ্য হইতে বাহির করিল । রোগিণীকে অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া একখানি লাল বেনারসি শাড়ি সন্তর্পণে তাহার মলিন বস্ত্রের উপর জড়াইয়া দিল । পরে একে একে এক-একগাছি চুড়ি তাহার হাতে দিয়া দুই হাতে দুই বালা পরাইয়া দিল । তার পরে ডাকিল , “ যতীন । ”

যতীন আসিতেই তাহাকে বিছানায় বসাইয়া পটল তাহার হাতে কুড়ানির একছড়া সোনার হার দিল । যতীন সেই হারছড়াটি লইয়া আস্তে আস্তে কুড়ানির মাথা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল ।

ভোরের আলো যখন কুড়ানির মুখের উপরে আসিয়া পড়িল তখন সে আলো সে আর দেখিল না । তাহার অম্লান মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইল , সে মরে নাই – কিন্তু সে যেন একটি অতলস্পর্শ সুখস্বপ্নের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেছে ।

যখন মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময় হইল তখন পটল কুড়ানির বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল , “ বোন , তোরা ভাগ্য ভালো । জীবনের চেয়ে তোরা মরণ সুখের । ”

যতীন কুড়ানির সেই শান্তস্নিগ্ধ মৃত্যুচ্ছবির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল , ‘ যাঁহার ধন তিনিই নিলেন , আমাকেও বঞ্চিত করিলেন না । ’